بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ১৫ মে, ২০২৬ মোতাবেক ১৫ হিজরত, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আমরা এ কথায় পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমান রাখি যে, পৃথিবীতে যদি কোনো কামেল মানব জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তাহলে তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। তাঁর মতো কোনো কামেল মানব তাঁর (সা.) পূর্বেও জন্মগ্রহণ করে নি, আর পরেও জন্মগ্রহণ করবে না। আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান এবং বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান আর সকল উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং যাবতীয় মানবিক গুণাবলির সর্বোচ্চ সকল মার্গ মহানবী (সা.) অতিক্রম করেছেন। যে-কোনো চারিত্রিক গুণের কথাই ধরুন না কেন– এর সর্বোচ্চ মার্গ তাঁর মাঝে দেখা যায়। এটি অন্য কোনো মানুষের মাঝে ছিল না, বর্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

এসব গুণ ও চরিত্রের মধ্যে একটি হলো বিনয় ও নম্রতার বৈশিষ্ট্য, যার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তাঁর (সা.) সত্তায় দেখা যায়। নিজের মান্যকারীদেরকেও তিনি (সা.) সর্বদা এই উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মু'মিনের উচিত সর্বদা বিনয়ের বৈশিষ্ট্যকে নিজের জীবনের অংশে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করা। মহানবী (সা.)-এর এই সুমহান চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এভাবে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (সূরা আল-কাহ্ফ:১১০)

"তুমি তাদের বলে দাও, আমি তো কেবল তোমাদের মতোই একজন মানুষ।"

আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) সর্বশেষ এবং কামেল শরীয়ত আনয়নকারী নবীর মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। তারপরও তাঁর (সা.) মাধ্যমে এই ঘোষণাই করিয়েছেন যে, বলে দাও, আমি একজন মানুষ এবং একজন দুর্বল বান্দা। যাহোক, এ প্রসঙ্গে আজ আমি কিছু হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যার মাধ্যমে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তাঁর (সা.) এই গুণ বা বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **আমাদের নবী করীম (সা.) অপেক্ষা কোনো কামেল মানবের আদর্শ পৃথিবীতে বিদ্যমান নেই এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা হতেও পারে না। এরপর দেখো! অলৌকিক মু'জিযা লাভের পরও মহানবী (সা.)-এর সার্বক্ষণিক অবস্থা ছিল (খোদা তা'লার) দাসত্ব।** *তিনি (সা.) বিনয়ী মানুষ ও বিনয়ী বান্দা হিসেবেই জীবন অতিবাহিত করেছেন* **আর বারংবার এ কথাই বলতেন,** إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ *(আমি তো কেবল তোমাদেরই মতো একজন মানুষ)।* **এমনকি তওহীদের কলেমায় নিজের দাসত্বের স্বীকৃতিকে অত্যাবশ্যকীয় দিক আখ্যায়িত করেছেন, যা ব্যতীত কোনো মুসলমান মুসলমানই হতে পারে না। চিন্তা করো এবং ভেবে দেখো! যেখানে কামেল পথপ্রদর্শকের আচরিত জীবন আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, নৈকট্যের সর্বোচ্চ মার্গে উপনীত হয়েও নিজের দাসত্ব ও বন্দেগির স্বীকৃতি বিসর্জন দেন নি, সেখানে অন্য কারো এমনটি ধারণা করা এবং অন্তরে এমন কথার উদ্রেক হওয়া সম্পূর্ণ অহেতুক ও নিরর্থক।**

এরপর তিনি (আ.) বলেন, **বৃথা আস্ফালন এবং অনর্থক অহংকার ও বড়াই পরিহার করা উচিত এবং বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা উচিত। দেখো! মহানবী (সা.)– যিনি প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বড়ো এবং মাহাত্ম্যের যোগ্য অধিকারী ছিলেন, তাঁর বিনয় ও নম্রতার একটি দৃষ্টান্ত পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। লেখা আছে, একজন অন্ধ ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন। একদিন তাঁর (সা.) কাছে মক্কার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং শহরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি (সা.) তাদের সাথে আলাপচারিতায় ব্যস্ত ছিলেন। আলোচনায় ব্যস্ত থাকার কারণে কিছুটা বিলম্ব হওয়ায় সেই দৃষ্টিহীন ব্যক্তি উঠে চলে যায়। এটি একটি সাধারণ বিষয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এ সম্পর্কে একটি গোটা সূরা অবতীর্ণ করেন। তখন মহানবী (সা.) তার বাড়ি যান এবং তাকে সাথে করে নিয়ে এসে নিজের পবিত্র চাদর বিছিয়ে তাকে বসান। আসল কথা হলো, যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য থাকে, তাদেরকে অবশ্যই বিনয়ী ও নম্র হতে হয়, কারণ তারা সর্বদা খোদার অমুখাপেক্ষিতার কারণে ভীতসন্ত্রস্ত ও প্রকম্পিত থাকেন।**

কাজেই, এটি কেবল পবিত্র কুরআনের বা মসীহ্ মওউদ বর্ণিত কেবল একটি ঘটনাই নয়, বরং এটি একটি শিক্ষা যা আমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ; যদি তাঁকে ভালোবাসার দাবি করো তাহলে তোমরাও বিনয় এবং নম্রতার সর্বোচ্চ মান অর্জনের চেষ্টা করো।

মহানবী (সা.) একজন মু'মিনকে বিনয়ের প্রকৃত তাৎপর্য এবং এর ওপর আমল করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে এক স্থানে বলেছেন, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন; মহানবী (সা.) বলেন:

প্রত্যেক মানুষের মাথার সাথে দুটি শিকল বাঁধা রয়েছে। একটি শিকল আকাশের দিকে এবং অপরটি ভূমির দিকে। যখন বান্দা বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, তখন সেই ফেরেশতা যার হাতে আকাশের দিকের শিকলটি রয়েছে, সে তাকে টেনে ওপরের দিকে তুলে নেয়। *বান্দা বিনয়ের কারণে নীচে ঝুঁকে গেলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে ওপরের মর্যাদা দান করেন, আর* **যখন সে অহংকার ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করে, তখন ভূমির দিকের শিকলটি তাকে নীচের দিকে টেনে নেয়।"**

অহংকারীর কোনো কর্ম গ্রহণযোগ্য হয় না, সে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে অধঃপতিত হয়, ভূপাতিত হয় বা মাটিতে পড়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক আরও বর্ণিত হয়েছে, **বান্দা যখন বিনয় অবলম্বন করে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত উন্নীত করে দেন।** কাজেই, আমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি, তাহলে এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে 'বিনয়' (অবলম্বন)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **সদকা দিলে সম্পদে কোনো ঘাটতি হয় না। আর কেউ যদি মার্জনা করে তাহলে আল্লাহ্ তার সম্মানই বৃদ্ধি করেন,** *অর্থাৎ ক্ষমা করলে সম্মান বৃদ্ধি পায়* **এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।**

অতএব, একজন মু'মিনের জন্য এসব নীতিগত কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, সদকা এবং আর্থিক কুরবানীর ফলে সম্পদ কমে যায় না বরং বৃদ্ধি পায়; তাই এই সন্দেহ মন থেকে দূর করে দাও যে, আর্থিক কুরবানীর কারণে তোমাদের সম্পদে কোনো ঘাটতি দেখা দেবে। ক্ষমা ও মার্জনা করলে সম্মান কমে না বরং সম্মান বাড়ে। লোকেরা যদি এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান এবং সামাজিক বিরোধের নিষ্পত্তি

হয়ে যাবে। এরপর তিনি (সা.) বলেছেন, **আর বিনয় অবলম্বন করলে আল্লাহ্ তা'লা উচ্চ মর্যাদা দান করেন।** তোমরা যত বেশি বিনয়ী হবে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে ততটাই সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন।

মহানবী (সা.)-এর নিজের বিনয়ের মান কেমন ছিল! হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একদা জনৈক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলে, **হে মুহাম্মদ (সা.)! হে আমাদের নেতার পুত্র নেতা! হে আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তির সর্বোত্তম সন্তান!** তখন মহানবী (সা.) বলেন, **হে লোকসকল! তাকওয়া বা খোদাভীরুতাকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নাও। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। আমি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্, আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রসূল। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ আমাকে যে মর্যাদা দান করেছেন, তোমরা তা অতিরঞ্জিত রূপে বর্ণনা করবে– এটি আমি পছন্দ করি না।**

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) দ্বারা যে ঘোষণা করিয়েছেন, নিজের বাস্তব আদর্শের মাধ্যমেও তিনি (সা.) এর প্রমাণ দিয়েছেন। এরপর তাঁর (সা.) বিনয়ের পরাকাষ্ঠার আরেকটি দৃষ্টান্ত হাদীসে দেখা যায়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, কারও কর্ম কখনোই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। সাহাবীরা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনাকেও নয়? তিনি (সা.) বলেন, না, আমাকেও নয়; তবে যদি আল্লাহ্ আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ এবং রহমত দ্বারা আবৃত করে নেন (তাহলে ভিন্ন কথা)। তাই যে কাজই করবে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে করবে এবং তা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করবে। আর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যেন কখনো মৃত্যু কামনা না করে; যদি সে পুণ্যবান হয় তবে হতে পারে– সে পুণ্যের ক্ষেত্রে আরও উন্নতি করবে, আর যদি সে মন্দ হয় তবে হতে পারে– সে তওবা করে আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাবে।

এরপর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, মিসকীনদেরকে ভালোবাসবে, কেননা আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তাঁর দোয়ায় একথা বলতে শুনেছি যে:

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ

অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! আমাকে মিসকীন হিসেবে জীবিত রাখো এবং মিসকীন হিসেবে মৃত্যু দিয়ো আর মিসকীনদের দলেই আমাকে পুনরুত্থিত কোরো।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবী আওফা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) অজস্র ধারায় যিকর করতেন এবং অনর্থক কাজে লিপ্ত হতেন না, অর্থাৎ আল্লাহ্র যিকর খুব বেশি করতেন। নামায দীর্ঘ করতেন এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত দিতেন। তিনি (সা.) বিধবা ও মিসকীনদের সাথে চলতে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে কোনো প্রকার সংকোচ বা দ্বিধাবোধ করতেন না। ইবাদতের উচ্চ মার্গ তো ছিলই, কিন্তু বিনয় ও নম্রতার চিত্র হলো, যে-কোনো মিসকীন এবং বিধবার কথা শোনার জন্য পূর্ণ ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে তাদেরকে সময় দিতেন। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন, মদীনার বাসিন্দাদের দাসীদের মধ্য থেকে একজন দাসীও নিজের প্রয়োজনে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাত ধরে তাঁকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যেত।

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক মহিলা যার বোধবুদ্ধি কিছুটা কম ছিল– সে একদা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার সাথে আমার কাজ আছে। তিনি (সা.) বলেন, হে অমুকের মা! দেখো, তুমি যে গলিতেই চাও আমাকে নিয়ে চলো, যতক্ষণ না আমি তোমার কাজ করে দিই। এরপর তিনি (সা.) তার সাথে একটি রাস্তায় গেলেন যতক্ষণ না সে তার কাজের কথা জানাল এবং তা করিয়ে নিল; অর্থাৎ তার যে দাবি ছিল তা পূর্ণ হয়ে গেল। যাহোক, রেওয়ায়েতে এই মহিলার নাম উম্মে যাফর বর্ণিত হয়েছে যিনি হযরত খাদিজা (রা.)-এর সেবিকা ছিলেন এবং বুদ্ধিতে কিছুটা খাটো বা দুর্বল ছিলেন, অর্থাৎ খুব একটা বুদ্ধিমতী ছিলেন না, সামান্য দুর্বলতাও হয়ত ছিল; কখনো কখনো এমন মানুষও থাকে যারা কথা বুঝতে পারে না, ভালো বোধবুদ্ধি থাকে না। এমন নয় যে, আল্লাহ্ না করুন– তিনি মানসিকভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু যা-ই হোক, ততটা বুদ্ধিমতীও ছিলেন না। কিন্তু মহানবী (সা.) তারও আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, আদী বিন হাতিম (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং মদীনায় পৌঁছলাম; আর মসজিদে প্রবেশ করে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে সালাম করলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি নিবেদন করলাম, আমি আদী বিন হাতিম। রসূলুল্লাহ্ (সা.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমাকে তাঁর ঘরের দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন। পথিমধ্যে একজন দুর্বল বৃদ্ধা মহিলা এল এবং সে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর (সা.) কাছে নিজের কোনো প্রয়োজনের কথা বলল। মহানবী (সা.) তার খাতিরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তিনি (আদী) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, এই ব্যক্তি বাদশা হতে পারে না। বাদশারা তো এভাবে গরিবদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে না। রাজাদের মাঝে এমন শিষ্টাচার থাকে না। এরপর মহানবী (সা.) আমাকে নিয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং একটি মোটা গদি উঠিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন, এর ওপর বসো। *ঘরে একটি কুশনের মতো পড়ে ছিল, তা তিনি এই মেহমানকে দিয়ে দিলেন।* আমি নিবেদন করলাম, আপনিই এতে বসুন। তিনি (সা.) বলেন, না, তুমি বসো। অবশেষে আমি এর ওপর বসলাম এবং তিনি (সা.) মাটিতে বসলেন। আমি মনে মনে বললাম, এই আচরণ কখনোই বাদশাদের মতো নয়। এগুলো তো অত্যন্ত বিনয়ী মানুষের বৈশিষ্ট্য।

তিনি (সা.) শিশুদের সাথেও স্নেহ ও বিনয় প্রকাশ করতেন। তাদেরকে আগে সালাম দিতেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আনসারের কাছে গেলে তাদের শিশুদেরকে সালাম করতেন, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, একবার এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয় এবং তিনি (সা.) তার সাথে কথা বলেন, আর হুযূর (সা.)-এর প্রতাপের কারণে তার কাঁধ কাঁপতে থাকে। তিনি (সা.) তাকে বলেন, শান্ত হও! আমি কোনো রাজা নই; আমি তো এমন এক নারীর সন্তান যে শুকনো মাংস খেত।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, দেখো, আমাদের নবী করীম (সা.)-এর সাফল্যসমূহ যদিও এমন ছিল যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর মাঝে এর কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) যতই সাফল্য দান করেছেন, তিনি (সা.) ততটাই বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করেছেন। একবারের ঘটনা, এক ব্যক্তিকে হুযূর (সা.)-এর সামনে ধরে আনা হয়; তিনি (সা.) দেখলেন, সে খুব কাঁপছে এবং ভয় পাচ্ছে। কিন্তু

যখন সে কাছে এল তখন তিনি (সা.) অত্যন্ত নম্রতা এবং স্নেহের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমিও তোমারই মতো একজন মানুষ এবং এক বৃদ্ধার সন্তান।

বাহ্যিক আড়ম্বর ও কৃত্রিমতারও তিনি (সা.) অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। এর প্রকাশ তাঁর (সা.) মদীনায় হিজরতের সময়ের একটি ঘটনায় পাওয়া যায়। আমরা তা অনেকবার শুনেছি। যেমনটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মদীনায় হিজরতের সময় যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় আসেন তা শোনামাত্রই মুসলমানরা উঠে নিজেদের হাতিয়ারের দিকে ছোটে এবং 'হাররা' প্রান্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অভ্যর্থনা জানায়। তিনি (সা.) তাদেরকে সাথে নিয়ে ডান দিকে মোড় নেন এবং বনু আমর বিন অওফের মহল্লায় তাদের কাছে আসেন আর এটি ছিল সোমবার এবং রবিউল আউয়াল মাস। হযরত আবু বকর (রা.) লোকদের সাথে সাক্ষাতের জন্য দাঁড়ান আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) নীরবে বসে থাকেন; আর আনসারের মধ্যে যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে (আগে) দেখে নি তারা এসে হযরত আবু বকর (রা.)-কে সালাম করতে থাকে, এমনকি এক পর্যায়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওপর রোদ পড়তে লাগে। হযরত আবু বকর (রা.) ওঠেন এবং তিনি মহানবী (সা.)-এর ওপর নিজের চাদর দিয়ে ছায়া করেন। তখন লোকেরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে চিনতে পারে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত উমর (রা.)-কে বলতে শুনেছেন; তিনি (রা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি কোরো না, যেভাবে খ্রিষ্টানরা মরিয়ম-পুত্রের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তো কেবল আল্লাহ্‌র বান্দা; সুতরাং তোমরা এ কথাই বলো যে, (আমি) আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল।

অনুরূপভাবে আলী বিন হাসান (রা.) তাঁর পিতার বরাতে বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে ইসলামের ভালোবাসার কারণে ভালোবাসো। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বলেছেন, 'আমার প্রকৃত মর্যাদার চেয়ে আমাকে বড়ো করো না, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে রসূল বানানোর পূর্বে নিজের বান্দা বানিয়েছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, ইসলামের ভালোবাসার কারণে ভালোবাসো।

মুতাররিফ বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা বলেছেন, আমি বনু আমেরের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়েছিলাম। আমরা নিবেদন করি, আপনি আমাদের নেতা। তিনি (সা.) বলেন, প্রকৃত নেতা হলেন আল্লাহ্ তা'লা। আমরা নিবেদন করি, আপনি আমাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অনুগ্রহ করার দিক থেকে আমাদের সবার চেয়ে মহান। তিনি (সা.) বলেন, কাজের কথা বলো; অথবা তিনি বলেন, শয়তান যেন তোমাদের উদ্ধত করে না তোলে। এটিই ছিল তাঁর (সা.) বিনম্রতার মান। তিনি তখনই থামিয়ে দেন যে, এসব কথা বাদ দাও; পাছে এগুলো পরে তোমাদের মধ্যে স্থায়ী রূপ ধারণ করে। তোমাদের আসল যে উদ্দেশ্য, যে জন্য এসেছ– তা বর্ণনা করো এবং আমার ব্যাপারে ভুল কথা বোলো না; যদিও তাঁর জন্য যে-সব প্রশংসামূলক শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছিল, তা বৈধ ছিল।

হযরত রবীয়া বিনতে মুআউভিয বিন আফরা বলতেন, যখন আমার রুখসতানা (কন্যাবিদায়) হলো, তখন মহানবী (সা.) আমার ঘরের ভেতরে এলেন এবং আমার বিছানায় সেভাবে বসলেন যেভাবে তুমি আমার কাছে বসে আছো। *যার কাছে তিনি বর্ণনা করছিলেন, তাকে তিনি এটি বলেছিলেন।* যাহোক, সেই সময় আমাদের কিছু মেয়ে 'দফ' (এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র) বাজাতে শুরু করে এবং আমার পরিবারের সেসব বুযুর্গের প্রশংসা

করতে থাকে যারা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। আর সেসব কবিতার মধ্যে একটি মেয়ে বলে, আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী আছেন যিনি জানেন আগামীকাল কী ঘটবে। তিনি (সা.) তখনই বলেন, এটি বাদ দাও এবং সেটিই গাও যা আগে গাইছিলে। এ কথাগুলো ভুল যে, আমি অদৃশ্যের খবর জানি; গায়েবের সংবাদ কেবল আল্লাহ্ তা'লা জানেন। হযরত আবদুল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কারো (এ কথা) বলা উচিত নয়– আমি ইউনুস বিন মাত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। নিজে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তিনি এ তুলনা করতে নিষেধ করেছেন এবং পরম বিনয় প্রকাশ করেছেন।

একইভাবে হযরত আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে, হে খায়রুল বারিয়্যা *অর্থাৎ হে সৃষ্টির সেরা ব্যক্তি*! এটি শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তিনি তো ইবরাহীম (আ.) ছিলেন। নিঃসন্দেহে মহানবী (সা.) খায়রুল বারিয়্যা ছিলেন ও আছেন এবং তিনিই সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, রসূলদের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তিনি পরম বিনম্রতাবশত এটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি আরোপ করেন। তাঁর বিনয়ের একটি উদাহরণের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়– হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-কে তিনবার ডাকে এবং প্রতিবারই তিনি (সা.) বলেন, লাব্বাইক, লাব্বাইক (অর্থাৎ আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত)। যখন প্রায় পুরো আরব জয় হয়ে গেল, তখন এই আরব-বিজেতা এক লাখেরও বেশি সাহাবীর সাথে হজ্জ পালন করেন এবং সেই সময় তাঁর বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখুন! হযরত আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হজ্জ করেছিলেন একটি সাধারণ হাওদা বিশিষ্ট উটের ওপর চড়ে এবং এমন একটি চাদর গায়ে দিয়ে যার মূল্য ছিল চার দিরহামের সমান, বরং তার চেয়েও কম ছিল; অর্থাৎ খুব সাধারণ একটি চাদর ছিল। আর তিনি (সা.) বলেছিলেন, اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لا رِيَاءَ وسُمْعَةً অর্থাৎ হে আল্লাহ্! এমন হজ্জ হোক, যাতে কোনো লোক-দেখানো ভাবও থাকবে না এবং সুনামের আকাঙ্ক্ষাও থাকবে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর নামের প্রেক্ষাপটে তাঁর প্রশংসা ও স্তুতি করতে গিয়ে বলেন, 'আহমদ' নামটি হলো 'জামাল' তথা সৌন্দর্যের প্রকাশ এবং এর বিপরীতে 'মুহাম্মদ' নামটি হলো 'জালাল' তথা প্রতাপের বিকাশ। *মহানবী (সা.)-এর দুটি নাম।* এর কারণ হলো, 'মুহাম্মদ' নামের মধ্যে প্রেমাস্পদ হবার রহস্য নিহিত। অর্থাৎ তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজন, কেননা তিনি সমস্ত প্রশংসার সমাহার ও পরম পর্যায়ের সৌন্দর্য। আর সমস্ত প্রশংসার সমাহার হওয়া প্রতাপ ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে। *অর্থাৎ তিনি সমস্ত প্রশংসার সমষ্টি, আর সমস্ত প্রশংসার সমাহার তখনই হয় যখন আল্লাহ্ তা'লার মহিমাও তাঁর ওপর প্রকাশ পায় এবং তিনিও তা প্রকাশ করেন; আর আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে তাঁকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন, তাঁর সেই উচ্চ মর্যাদাও যেন প্রকাশ পায়।* কিন্তু 'আহমদ' নামের মধ্যে প্রেমিকসুলভ রহস্য রয়েছে। এতে প্রেমিকসুলভ রং সুপ্ত আছে, কারণ প্রশংসাকারী হবার জন্য বিনয়, প্রেমিকসুলভ বিনয় ও নম্রতা অপরিহার্য, একেই জামালী অবস্থা বলা হয়। 'আহমদ' নামটি দ্বারা সৌন্দর্যময় অবস্থা এ কারণে বুঝানো হয় যে, এতে প্রেম-ভালোবাসার দিক বিদ্যমান এবং এই অবস্থা নম্রতা ও বিনয়ের দাবি রখে। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের নবী (সা.)-এর মধ্যে প্রেমাস্পদের মহিমাও ছিল; মুহাম্মদ নামের দাবি এটিই ছিল। *অর্থাৎ মুহাম্মদ নামই এ বিষয়ের দাবি করে যে, তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় ছিলেন।* কারণ 'মুহাম্মদ' তথা সকল প্রশংসার সমাহার হওয়া

প্রেমাস্পদ হবার মর্যাদা সৃষ্টি করে। মহানবী (সা.) এর মধ্যে প্রেমিকসুলভ মহিমাও ছিল, যা আহমদ নাম দাবি করে থাকে। *অর্থাৎ আহমদ নামের দাবি হলো– তাঁর (সা.) মাঝে ভালোবাসার যোগ্যতাও থাকবে,* কেননা একজন প্রশংসাকারীর জন্য প্রেমিক হওয়া আবশ্যক। কারণ একজন ব্যক্তি কারো সত্যিকারের প্রশংসা তখনই করে যখন সে তার প্রেমিক হয়। আর প্রেমিক হবার জন্য বিনয় থাকা অপরিহার্য। *কারও প্রেমে পড়তে হলে নম্রতা দেখাতে হয়, ভয় ও প্রতাপ প্রদর্শন করে প্রেম প্রকাশ করা যায় না।* আর এটাই সেই জামালী বা কোমল অবস্থা যা আহমদ নামের অপরিহার্য বাস্তবতা। মুহাম্মদ নামের মধ্যে যে প্রেমাস্পদসুলভ বিশেষত্ব ছিল তা সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল। আর যারা অবমাননাকারী ও হত্যাকারী ছিল, আল্লাহ্‌র প্রিয় হবার প্রতাপ তাদের দমন করেছিল। তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র প্রিয় ছিলেন, তাই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতাপ ও মহিমা প্রকাশ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে প্রতাপের প্রকাশ ঘটিয়ে শত্রুদের চূর্ণবিচূর্ণ করেছেন।

এর আরো ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, তাঁর (সা.) পবিত্র নামগুলোর মধ্যে একটি গোপন রহস্য হলো– মুহাম্মদ এবং আহমদ এই নাম দুটির পৃথক পৃথক শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। মুহাম্মদ নাম প্রতাপ ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রশংসার দাবি করে, অর্থাৎ যার সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করা হয়েছে। এর মধ্যে এক ধরনের প্রেমাস্পদসুলভ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কারণ প্রেমাস্পদের প্রশংসা করা হয়ে থাকে। তাই এতে প্রতাপের বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। কিন্তু আহমদ নামের মধ্যে প্রেমিকসুলভ দিক রয়েছে, কারণ প্রশংসা করা প্রেমিকের কাজ; সে তার প্রিয়ভাজন ও প্রেমাস্পদের প্রশংসা করতে থাকে। তাই যেভাবে মুহাম্মদ নাম প্রেমাস্পদ হিসেবে প্রতাপ ও মাহাত্ম্য চায়, তেমনি আহমদ নাম প্রেমিকসুলভ অবস্থায় দারিদ্র্য, বিনয় ও নম্রতার দাবি রাখে। *এই দ্বিতীয় নাম আহমদ-এর মাধ্যমে বিনয় ও নম্রতার প্রকাশ পায়।* এর মধ্যে নিহিত আরেকটি রহস্য হলো, মহানবী (সা.)-এর জীবনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। একটি ছিল মক্কার জীবন– যা ছিল তেরো বছর দীর্ঘ, আর অন্যটি ছিল মদীনার জীবন– যা ছিল দশ বছরের। মক্কার জীবন আহমদ নামের বহিঃপ্রকাশ ছিল। সেই সময় তাঁর দিন-রাত আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আহজারি, ক্রন্দন, সাহায্যপ্রার্থনা এবং দোয়ায় অতিবাহিত হতো। বিনয় ও নম্রতার পরম বহিঃপ্রকাশের সাথে ছিল এর সম্পর্ক। যদিও পরবর্তী জীবনেও এই অবস্থাই ছিল, কিন্তু এখানে বিশেষভাবে কেবল এই গুণটিই প্রকাশ পাচ্ছিল। সেসময় কীভাবে তাঁর সময় অতিবাহিত হতো– কেউ যদি তাঁর (সা.) সেই মক্কার জীবনের সময়কাল সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হয়, তবে সে বুঝতে পারবে যে, তিনি (সা.) মক্কার জীবনে যে পরম কাকুতিমিনতি করেছেন, তা কোনো প্রেমিক তার প্রিয়জনের সন্ধানে কখনো করে নি এবং করতেও পারবে না। *আল্লাহ্ তা'লার প্রেমে যেভাবে তিনি (সা.) সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়েছিলেন– সেটির উদাহরণ এখানে তিনি (আ.) বর্ণনা করছেন যে, যদিও তাঁর (সা.) সমস্ত জীবনই এ বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু বিশেষভাবে সেই যুগে এটিই প্রকাশিত হয়েছে।* উপরন্তু তাঁর (সা.) আকুতি ও কান্না নিজের জন্য ছিল না, বরং তা পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতার কারণে ছিল। কারণ আল্লাহ্‌র ইবাদতের নামনিশানাও তখন প্রায় মুছে গিয়েছিল, আর তাঁর (সা.) আত্মা ও প্রকৃতিতে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমানের মাধ্যমে এক বিশেষ আনন্দ ও প্রশান্তি সৃষ্টি হয়েছিল এবং স্বভাবতই তিনি এই পরম আনন্দ ও ভালোবাসা দিয়ে পৃথিবীবাসীকে সিক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অপরদিকে যখন তিনি পৃথিবীর (শোচনীয়) অবস্থা অবলোকন

করতেন, যখন তাদের সামর্থ্য ও প্রকৃতির মাঝে এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল এবং তারা অনেক কষ্ট ও নানামুখী বিপদাপদের সম্মুখীন ছিলেন। মোটকথা, পৃথিবীর এই করুণ অবস্থা দেখে তিনি এমন আহাজারি করতেন যে, প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম হতো। এই অবস্থার প্রতিই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ (সূরা শু'আরা: ৪)

অর্থ: **হয়ত তুমি এই দুঃখে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে যে, তারা কেন ঈমান আনছে না?** এটি ছিল তাঁর কাতর জীবনের চিত্র এবং এর (জীবনের) মাঝে 'আহমদ' নামের বহিঃপ্রকাশ ছিল। সে সময় তিনি এক মহান লক্ষ্যে মগ্ন ছিলেন। এই লক্ষ্যের পূর্ণ বিকাশ মদীনার জীবনে এবং 'মুহাম্মদ' নামের প্রকাশের সময়কালে হয়েছিল, যেমনটি এই আয়াত থেকে ধারণা পাওয়া যায়; *সেটি প্রাথমিক যুগ ছিল অর্থাৎ 'আহমদ' নামের জীবন ছিল, আর মদীনায় আগমনের পর 'মুহাম্মদ' নামের জ্যোতির্বিকাশ ঘটে। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমেও শত্রুদের ধ্বংস করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন,* **সেই নামের (মুহাম্মদ) প্রকাশের সময় হয়েছিল যেরূপ এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে,**

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ (সূরা ইবরাহীম: ১৬)

আর তারা বিজয়ের জন্য দোয়া করলেন এবং প্রত্যেক স্বৈরাচারী ও সত্যের বিরোধী শত্রু ব্যর্থ ও নিষ্ফল হলো। *মদীনায় এসেও যখন শত্রুরা কঠোরতা প্রদর্শন করল, তখন আবারও 'মুহাম্মদ' নাম বিকশিত হলো এবং প্রত্যেক শত্রু ধ্বংস হয়ে গেল।* وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ *তারা বিজয়ের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন, আর আল্লাহ্ তা'লা শত্রুদের ওপর বিজয় দান করলেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর শত্রুদের ধ্বংস করে দিলেন।*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও এক স্থানে বলেন:

বিনয় ও নম্রতায় মহানবী (সা.)-এর অবস্থা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরম রূপে দেখা যায়, সেখানে বুঝা যায় যে, তিনি ফেরেশতাদের সাহায্য ও জ্যোতিতে ততটাই সাহায্যপ্রাপ্ত ও আলোকিত ছিলেন। যেমন আমাদের নবী করীম (সা.) নিজের ব্যবহারিক ও কর্মময় অবস্থার মাধ্যমে তা (প্রকাশ করে) দেখিয়েছেন। এমনকি তাঁর নূর ও কল্যাণের পরিধি এতটাই ব্যাপক ছিল যে, চিরকাল পর্যন্ত তারই দৃষ্টান্ত ও প্রতিফলন দেখা যায়। চিরকাল এই দৃষ্টান্তই পরিলক্ষিত হবে। সুতরাং এ যুগেও আল্লাহ্ তা'লার যত কল্যাণরাজি ও অনুগ্রহ অবতীর্ণ হচ্ছে, তা তাঁরই অনুগত্য ও তাঁরই অনুসরণে লাভ হচ্ছে। আমি সত্য বলছি এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি– কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ প্রকৃত সৎকর্মশীল ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভকারী গণ্য হতে পারে না এবং সেসব অনুগ্রহ, কল্যাণ, তত্ত্বজ্ঞান, সত্য ও দিব্যদর্শনের কল্যাণ লাভ করতে পারে না যা উচ্চমানের আত্মশুদ্ধির কারণে লাভ হয়ে থাকে, যতক্ষণ না সে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণে নিজেকে পূর্ণরূপে বিলীন করে দেয়। এর প্রমাণ স্বয়ং আল্লাহ্‌র কালাম (কুরআন) থেকেই পাওয়া যায়,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (সূরা আলে ইমরান: ৩২)

অর্থ: তুমি বলে দাও, হে লোকসকল! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো; তাহলে আল্লাহ্ও তোমাদের ভালোবাসবেন। আল্লাহ্‌র এই প্রতিশ্রুতির বাস্তব ও জীবন্ত নিদর্শন আমি নিজেই। *তিনি (আ.) বলেন, আমি এই*

প্রুতিশ্রুতির বাস্তব প্রমাণ। আমি নবী করীম (সা.)-কে ভালোবাসি এবং আল্লাহ্‌র কল্যাণরাজি আমার ওপর নাযিল হচ্ছে। আল্লাহ্‌র কুরআনে তাঁর প্রিয় বান্দা ও অলীদের জন্য যে নিদর্শন নির্ধারিত আছে, সেই নিদর্শনের মাধ্যমেই আমাকে শনাক্ত করো।

মোটকথা, মহানবী (সা.)-এর চারিত্রিক পরাকাষ্ঠা এমন যে, কোনো বৃদ্ধাও যদি তাঁর হাত ধরে ফেলতেন, তাৎক্ষণিক তিনি সসম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনতেন। যতক্ষণ না বৃদ্ধা নিজে তাঁকে ছেড়ে দিতেন, তিনি তার হাত ছাড়তেন না।

একটি রেওয়ায়েতে তাঁর (সা.) বিনয় ও সরলতার বিষয়টি এভাবে বিদ্যমান– হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) রোগীর খোঁজখবর নিতেন, জানাযার নামাযে উপস্থিত হতেন, আর গাধার ওপরও আরোহণ করতেন; *সাধারণ বাহন থাকলে তাতেও আরোহণ করতেন।* ক্রীতদাসের নিমন্ত্রণও গ্রহণ করতেন। আর বনু কুরাইযার যুদ্ধের দিন তিনি (সা.) গাধার পিঠে আরোহিত ছিলেন, যার লাগাম ছিল খেজুরের ছাল দিয়ে তৈরি রশি, আর সেটির ওপর খেজুরের ছালের জিন বাঁধা ছিল। *অন্য কথায়, অত্যন্ত সাদামাটা ছিল।*

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উসমান (রা.) একটি খুতবায় বলেন, **আল্লাহ্‌র কসম! আমরা সফরেও এবং আবাসে মহানবী (সা.)-এর সান্নিধ্য লাভ করেছি। তিনি (সা.) আমাদের অসুস্থদের দেখতে যেতেন, আমাদের জানাযার সাথে যেতেন, সর্বত্র সকল কাজে আমাদের সাথে থাকতেন।**

একইভাবে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, **মহানবী (সা.) বলেন, আমাকে যদি ছাগলের একটি পায়া খাওয়ার জন্যও নিমন্ত্রণ দেওয়া হয় তাহলে আমি সেই নিমন্ত্রণ অবশ্যই গ্রহণ করব। আর যদি ছাগলের একটি পায়া আমাকে উপহারস্বরূপ পাঠানো হয় তাহলে আমি সেটি অবশ্যই গ্রহণ করব।** অর্থাৎ সামান্য ও সাধারণ কোনো নিমন্ত্রণ হোক বা উপহার হোক– তিনি (সা.) তা সানন্দে গ্রহণ করতেন।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, **একদিন মহানবী (সা.)-কে যবের রুটি ও পুরাতন চর্বির দাওয়াতে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি (সা.) সানন্দে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।**

একটি রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.)-এর সাধারাণ খাদ্যাভ্যাসের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়– হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, **একদিন এক দর্জি মহানবী (সা.)-কে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ দেন, যা তিনি প্রস্তুত করেছিলেন।** হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, **মহানবী (সা.)-এর সাথে আমিও সেই নিমন্ত্রণে যাই। মহানবী (সা.)-এর সামনে তিনি রুটি ও ঝোল উপস্থাপন করেন যার মাঝে লাউ ও মাংসের টুকরো ছিল।** *লাউ ও মাংসের তরকারি ছিল।* **মহানবী (সা.)-কে দেখি, তিনি পাত্রের যেখানে লাউ ছিল, সেখান থেকে নিচ্ছিলেন এবং মাংস বাদ দিচ্ছিলেন।** হযরত আনাস (রা.) বলতেন, **আমি সেদিন থেকেই লাউ খাওয়া শুরু করে দিলাম।** *আমি লাউ পছন্দ করতে লাগলাম।*

এখানে আমি আমাদের মেহমানদের জন্যও একটি কথা বলে দিচ্ছি, এখানে তাদের জন্যও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কেননা লঙ্গরে বিশেষ করে জলসার দিনগুলোতে কখনো কখনো লোকেরা আপত্তি করে থাকে যে, আমাদের আলু-মাংসের তরকারি থেকে শুধু আলু দেবেন না, মাংস দেবেন। মহানবী (সা.)-এর এই যে আদর্শ– তা সর্বদা নিজেদের

দৃষ্টিপটে রাখুন। খাবার তো হিসাব করে রান্না করা হয়, এজন্য যা পাওয়া যায় তা থেকেই খাওয়া উচিত। আর যে সবজি বা মাংসই দেওয়া হয়, তা সানন্দে খাওয়া উচিত।

এরপর আবেগ-অনুভূতির বিষয়ে সংবেদনশীলতা এবং বিনয়াবনতার একটি দৃষ্টান্ত একটি বর্ণনায় এভাবে পাওয়া যায়– হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, **মহানবী (সা.) এক কুষ্ঠরোগীর হাত ধরেন এবং তাকে নিজের সাথে একই পাত্রে খেতে দেন। অতঃপর বলেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খাও, আল্লাহ্‌র ওপর আস্থা ও ভরসা করে খাও।** একইভাবে হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, **মহানবী (সা.) একটি গাধার ওপর আরোহণ করেন; এতে ফাদাক-এ বানানো চাদর ছিল। আর মহানবী (সা.) উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে নিজের পিছনে বসান।** *এ ধরনের কোনো চিন্তা ছিল না যে, আমার সাথে কে বসেছে, কে নয়।*

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, **মহানবী (সা.) কুরবানীর দিন ফযল বিন আব্বাসকে উটের পিঠে তাঁর পেছনে বসান।** একইভাবে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, **মহানবী (সা.) যখন পবিত্র মক্কা নগরে প্রবেশ করেন তখন লোকেরা তাঁকে দেখার জন্য আসে। বিনয়ের আতিশয্যে তাঁর মাথা হাওদা স্পর্শ করছিল। তিনি (সা.) লোকদের মাঝে ছিলেন। বিজয় এবং মুসলমানদের আধিক্য দেখে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দাড়ি বিনয়ের কারণে হাওদা স্পর্শ করছিল বা প্রায় ছুঁয়ে ফেলার উপক্রম হচ্ছিল।** তিনি (সা.) বলেন, اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ **অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! নিশ্চয় প্রকৃত জীবন হলো পরকালেন জীবন।**

ন্যায়বিচার, ন্যায়পরায়ণতা, বিনয় ও নম্রতার একটি দিক এটিও ছিল যে, তিনি (সা.) নিজের পেছনে নিজের মুক্ত ক্রীতদাস যায়েদ বিন হারেসার (রা.) পুত্র উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে আরোহণ করিয়েছিলেন। অথচ কুরাইশের নেতৃবৃন্দের পুত্ররা ছিল, বনু হাশেমের পুত্ররা ছিল।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লেখেন, সেই উচ্চতা যা খোদা তা'লার বিশেষ বান্দাদের দেওয়া হয় সেটি বিনয়ের আদলে হয়ে থাকে। অপরদিকে শয়তানের উচ্চতা অহংকার মিশ্রিত হয়। *অর্থাৎ, তার মাঝে অহংকার থাকে।* লক্ষ করো! মহানবী (সা.) যখন মক্কা বিজয় করেন তখন তিনি সেভাবেই মাথা অবনত রাখেন ও সিজদা করেন যেভাবে তিনি সেসব বিপদ ও কষ্টের দিনগুলোতে মাথা নত করতেন ও সিজদা করতেন, যখন এই মক্কাতেই তাঁর সর্বপ্রকার বিরোধিতা করা হতো এবং দুঃখ দেওয়া হতো। যখন তিনি দেখলেন, আমি কোন অবস্থায় এখান থেকে বেরিয়েছিলাম ও এখন কোন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেছি– তখন তাঁর হৃদয় খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে যায় এবং তিনি (সা.) সিজদা করেন।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন, বদরের দিন আমাদের প্রতি তিনজন ব্যক্তির জন্য একটি করে উট নির্ধারিত ছিল। হযরত আবু লুবাবা (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন। যখন মহানবী (সা.)-এর পায়ে হাঁটার পালা আসে তখন এই দুই ব্যক্তি বলেন, আমরা আপনার স্থলে পায়ে হাঁটব আর আপনি বাহনে থাকুন। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা দুইজন পায়ে হাঁটার ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী নও, আর আমি তোমাদের দুইজনের তুলনায় প্রতিদান লাভের বিষয়ে অমুখাপেক্ষীও নই।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) নিজ সঙ্গীদের সাথে একটি সফরে ছিলেন। তিনি (সা.) একটি ছাগল দিয়ে খাবার প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশ দিলেন। একজন বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটি জবাই করা আমার দায়িত্ব। অপরজন বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটির চামড়া ছাড়ানো আমার দায়িত্ব। একজন বললেন, এটি রান্না করা আমার দায়িত্ব। এতে মহানবী (সা.) বললেন, আর জ্বালানী সংগ্রহ করা আমার দায়িত্ব। সাহাবীরা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরাই যথেষ্ট। তিনি (সা.) বললেন, আমি জানি তোমরা যথেষ্ট, কিন্তু আমি তোমাদের মাঝে বিশেষত্ব চাই না। বান্দা নিজ সঙ্গীদের ওপর কোনো বিশেষত্ব প্রকাশ করবে– তা আল্লাহ্‌ অপছন্দ করেন। এরপর তিনি (সা.) উঠলেন এবং জ্বালানী সংগ্রহ করতে লাগলেন। এমন কোনো পরিস্থিতি আসত না যেখানে তিনি (সা.) স্পষ্টভাবে নিজের বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ না করতেন।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, আসওয়াদ বর্ণনা করেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মহানবী (সা.) নিজ গৃহে কী কী করতেন? তিনি (রা.) বলেন, তিনি (সা.) নিজেকে ঘরের লোকদের কাজে ব্যস্ত রাখতেন। অর্থাৎ, নিজ ঘরের লোকদের সাথে তাদের কাজে সহায়তা করতেন। যখন নামাযের সময় হতো তখন তিনি (সা.) নামাযের জন্য চলে যেতেন। সুতরাং এটি সেসব পুরুষের জন্যও শিক্ষণীয় যারা ঘরের কাজকর্ম করতে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে, আর স্ত্রীদেরও অভিযোগ থাকে ও অভিযোগ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

হিশাম বিন উরওয়া একইভাবে নিজ পিতার কাছ থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত আয়েশাকে (রা.) জিজ্ঞেস করেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) কি ঘরে কোনো কাজ করতেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ; রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) নিজের জুতা মেরামত করতেন, নিজের কাপড় সেলাই করতেন এবং নিজ গৃহে সেভাবেই কাজ করতেন যেভাবে তোমাদের কেউ নিজ ঘরে কাজ করে। এর দ্বারা এটিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর আদর্শ দেখে সাহাবীরা নিজেদের ঘরের কাজে নিজেদের স্ত্রীদের সহযোগিতা করতেন। কিন্তু এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত, ঘরের কাজের মূল দায়িত্ব স্ত্রীদের। আর এই কথাটি শুনে (স্ত্রীরা) যেন এমনটা ভেবে না বসে যে, তারা নিজেদের কর্তব্য থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। তবে পুরুষদের দায়িত্ব হলো স্ত্রীদের কাজে সহযোগিতা করা।

অনুরূপভাবে অন্য একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, কাসেম বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) নিজের গৃহে কী কাজ করতেন? তখন তিনি ব্যক্ত করেন, তিনি (সা.) মানুষদের মধ্য হতেই একজন মানুষ ছিলেন; নিজের কাপড় নিজে ঝাড়তেন, নিজের ছাগলের দুধ নিজে দোহাতেন এবং নিজের কাজ নিজেই সম্পাদন করতেন।

হযরত আবু বুরদা একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন; এধরনের রেওয়ায়েত পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে, এখাতে অতিরিক্ত একথার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তিনি (সা.) পশমি পোশাক পরিধান করতেন, গবাদিপশু বাঁধতেন এবং অতিথির দেখাশোনা নিজেই করতেন। অতিথি আপ্যায়নও নিজেই করতেন এবং সব ধরনের পোশাক– তা যতই মোটা ও খসখসে হোক– তিনি পরিধান করতেন; কোনো প্রকার দ্বিধাবোধ ছিল না। তাঁর পোশাক ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে।

হযরত আমের বিন রবীয়া (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি বললেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলাম। পথিমধ্যে তাঁর (সা.) জুতার ফিতা ছিঁড়ে

গেল। তখন আমি তাঁর জুতাটি নিয়ে ঠিক করতে লাগলাম। তখন তিনি (সা.) আমার হাত থেকে সেই জুতাটি নিলেন এবং বললেন, এটা একটি বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক আচরণ, আর আমি বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক আচরণ পছন্দ করি না।

হাসনা বিন খালিদ এবং সাওয়া বিন খালিদ (রা.) বর্ণনা করেন, তারা উভয়েই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে এমন সময় উপস্থিত হন যখন তিনি (সা.) কোনো দেয়াল অথবা নিজের কোনো ঘরের মেরামতের কাজে ব্যস্ত ছিলেন; স্বহস্তে নিজের ঘরের কাজ করছিলেন।

একইভাবে সহীহ্ বুখারীতে মসজিদে নববী নির্মাণের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। যখন নবী (সা.)-এর উটটি সেখানে গিয়ে থেমে পড়ে যেখানে দুই অনাথ বালকের জমি ছিল, তখন তিনি (সা.) বলেন, এই স্থানটি আমাদের জন্য উপযুক্ত। অতঃপর সেই বালকদের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও তিনি (সা.) তাদের সেই জমির মূল্য পরিশোধ করেন। আর তারপর যখন মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয় তখন তিনি (সা.) সাধারণ মানুষের সাথে যোগ দেন এবং ইট বহন করা আর মসজিদ নির্মাণের যে কাজ ছিল– তাতেও সশরীরে অংশ নেন।

অনুরূপভাবে হযরত বারা বিন আযেব (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি খন্দকের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দেখেছি, তিনি মাটি বহন করছিলেন। অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর বুকের পশমগুলোকে মাটি ঢেকে ফেলেছিল।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি সকালে আব্দুল্লাহ্ বিন আবি তালহাকে সাথে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে যাই যেন তিনি তাকে মধু খাইয়ে দেন। আমি তাঁকে এমন অবস্থায় পেলাম যে, তাঁর হাতে পশু দাগানোর লোহা ছিল। তিনি তাকে মধু খাওয়ালেন। *অর্থাৎ শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল, মধুর খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।* তখন তিনি কাজ করছিলেন। তাঁর হাতে পশুতে দাগ দেবার সেই যন্ত্রটি ছিল যা দিয়ে জন্তুর গায়ে দাগ দেওয়া হয়, যেন তা চিহ্নিত হয়ে যায়; আর তিনি সদকার উটগুলোকে চিহ্নিত করছিলেন। যেখানেই সুযোগ পেতেন, তা যদি নিজের করার মতো হতো তবে সহযোগিতার জন্য ডাকার পরিবর্তে নিজেই তা করে নিতেন।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আবু উমামা বাহলী বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাদের মাঝে আসেন আর তিনি একটি লাঠির ওপর ভর দিয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। এটি দেখে তিনি (সা.) বলেন, পারস্যের অধিবাসীরা তাদের বড়ো বড়ো ব্যক্তিদের সম্মানে যেভাবে দাঁড়িয়ে যায়– তোমরা তেমনটি কোরো না। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন। তখন তিনি দোয়া করেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদের ক্ষমা করো, আমাদের প্রতি দয়া করো, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও, আমাদের ইবাদত গ্রহণ করো, আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও, আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো, আর আমাদের সমস্ত বিষয়াদি শুধরে দাও। (সুনানে ইবনে মাজা, কিতাবুদ দোয়া, হাদীস নম্বর-৩৮৩৬)

বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের আকাঙ্ক্ষা হয়, তিনি যেন আমাদের আরও বেশি দোয়া দেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমি কি তোমাদের জন্য সমস্ত কল্যাণকর কথা এক

সুতোয় গেঁথে দিই নি? *অর্থাৎ, এটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি দোয়া, তোমরা এটাই করতে থাকো।*

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর বিনয়ের মান এমন ছিল যে, তিনি (সা.) নিজের আগমনে লোকদেরকে দাঁড়িয়ে সম্মান করতে বারণ করতেন। বলতেন, এটি তো ইরানীদের রীতি। আমি কোনো বাদশা নই বরং খোদা তা'লা আমাকে নবী বানিয়েছেন। সর্বোপরি মহানবী (সা.)-এর বিনয় সেই মানের ছিল যার দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। আর এটিই সেই আদর্শ যা অনুসরণে জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত যেন আমরাও আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনকারী হতে পারি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর আদর্শের আলোকে আমাদেরকে উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে বলেন, আমার দৃষ্টিতে পবিত্র হবার এটি উত্তম পদ্ধতি এবং এর চেয়ে ভালো অন্য কোনো পদ্ধতি পাওয়া সম্ভব নয়; আর তা হলো, মানুষ যেন কোনো প্রকারেই অহংকার না করে– জ্ঞানের কারণেও না, বংশমর্যাদারও না বা ধনসম্পদেরও না। খোদা তা'লা কাউকে চোখ দান করলে পরে সে দেখতে পাবে যে, প্রত্যেক আলো যা সেই সকল অন্ধকার থেকে মুক্তি দিতে পারে– তা আকাশ থেকেই এসে থাকে এবং মানুষ সর্বদা ঐশী আলোর মুখাপেক্ষী। আকাশ থেকে যে সূর্যের আলো এসে থাকে তা না আসলে চোখও দেখতে পায় না। একইভাবে অভ্যন্তরীণ আলো যা প্রত্যেক প্রকার অন্ধকারকে দূরীভূত করে এর পরিবর্তে খোদাভীতি ও পবিত্রতার নূর সৃষ্টি করে– তা আকাশ থেকেই এসে থাকে। আমি সত্য সত্যই বলছি, মানুষের খোদাভীতি, ঈমান, ইবাদত, পবিত্রতা সবকিছু আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এটি খোদা তা'লার অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। তিনি চাইলে একে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন আর চাইলে অপসারিত করতে পারেন। অতএব, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হলো, মানুষের নিজ সত্তাকে অর্থহীন এবং তুচ্ছ জ্ঞান করা আর মহান অস্তিত্বের দরবারে লুটিয়ে পড়ে বিনয় ও অক্ষমতার দোহাই দিয়ে খোদা তা'লার অনুগ্রহ যাচনা করা। সেই তত্ত্বজ্ঞানের আলো যাচনা করা যা প্রবৃত্তির আবেগকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে তার ভেতর এক প্রকার আলো এবং পুণ্যকর্মের জন্য শক্তিসামর্থ্য ও উষ্ণতা তৈরি করে। তারপর যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে কেউ এর অংশ লাভ করে এবং কোনো সময়ে সে যদি স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করে আর বক্ষ উন্মোচিত হয়, তবে সে যেন অহংকার ও গর্ব না করে; বরং তার বিনয় ও নম্রতা যেন আরও বৃদ্ধি পায়। কারণ মানুষ যতটা নিজেকে 'আমি কিছু নই' বলে মনে করবে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তত বেশি আধ্যাত্মিক আনন্দ ও ঐশী জ্যোতি বর্ষিত হবে যা তাকে আলো ও শক্তি জোগাবে। মানুষ যদি এই বিশ্বাস রাখে, তবে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তার চারিত্রিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। নিজেকে পৃথিবীতে কিছু মনে করাও এক ধরনের অহংকার, আর তখন মানুষের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, সে অন্যকে অভিশাপ দেয় আর তুচ্ছ জ্ঞান করে।

এরপর তিনি বলেন, মানুষ– যে এক দুর্বল সৃষ্টি– নিজের কর্ম দোষে নিজেকে বড়ো মনে করতে শুরু করে এবং তার মধ্যে অহংকার ও ঔদ্ধত্য চলে আসে। আল্লাহ্‌র পথে মানুষ নিজেকে যতক্ষণ সবার চেয়ে ছোটো মনে না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুক্তি পেতে পারে না। ভারতের একজন সুফি কবি 'কবীর ভগত' সত্যই বলেছেন:

ভালা হুয়া হাম নীচ ভালে হার কো কিয়া সালাম,
জে হোতে ঘর উঁচ কে মিলতা কাহাঁ ভগবান?

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দরবারে লাখো কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য নিবেদন করছি যে, আমরা ছোটো ঘরে জন্মেছি; যদি উঁচু বংশে জন্মাতাম, তবে হয়ত খোদার দেখা পেতাম না। লোকেরা যেখানে নিজেদের উঁচু বংশ নিয়ে গর্ব করত, কবীর সেখানে তাঁতির বংশে জন্ম নেবার কারণে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেন।

অতএব, মানুষের উচিত প্রতিটি মুহূর্তে নিজের দিকে তাকানো এবং একথা ভাবা যে, আমি কত-না তুচ্ছ! আমার অস্তিত্বই বা কী? একজন মানুষ যতই উচ্চ বংশের হোক না কেন, সে যদি আত্মবিশ্লেষণ করে, যদি চোখ থাকে– তাহলে সকল ক্ষেত্রে কোনো না কোনো দিক থেকে সমগ্র সৃষ্টির মাঝে নিজেকে অবশ্যই অযোগ্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করবে। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত একজন দরিদ্র ও অসহায় বৃদ্ধার সাথে সেই একই উত্তম আচরণ না করবে যা সে একজন উচ্চ বংশীয় ও প্রভাবশালী মানুষের সাথে করে বা করা উচিত, এবং যতক্ষণ না সে নিজেকে সব ধরনের অহংকার, ঔদ্ধত্য ও দম্ভ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে– ততক্ষণ সে কোনো অবস্থাতেই ঐশী রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ্‌কে পেতে হলে বিনয় ও নম্রতা একটি অপরিহার্য শর্ত।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)